দৈনিক আল আমিন 29
তারিখ 5 JUL 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬ ৪৩

শিক্ষা ও সংস্কৃতি চিন্তা

নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ

'শেষের কবিতা' উপন্যাসের নায়ক অমিতের মুখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এঁটে দিয়েছিলেন একটি সংলাপ– 'কমল হীরের পাথরটাকে বলে শিক্ষা, তার যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকে বলে কালচার।' জনজীবনের দীপ্ত প্রকাশের জন্যে কালচারকেও শিক্ষার সঙ্গী হতে হয়। কেননা, শিক্ষা মানুষকে উন্নত করে, সংস্কৃতি বহন করে রুচির পরিচয়। শিক্ষা যেমন দানের সামগ্রী নয়, সংস্কৃতিও রাতারাতি গড়ে ওঠার নয়। অথচ একের সাথে অপরের যোগ অচ্ছেদ্য। ঘাত–প্রতিঘাত ঝড়–ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে এবং রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা আবহমান বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেমন সুপ্রাচীরন, পরিমন্ডলও তেমনি বিস্তৃত। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে আবিষ্ট হওয়ার ফলে আমাদের এক অংশ বিস্মৃত হতে চলেছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তাৎপর্য, অপরঅংশ ভুলে যাচ্ছে শিক্ষার মূলমন্ত্রকে। সস্তা জনপ্রিয়তার মোহ, বিভ্রান্তিকর রাজনীতি এবং একশ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী লোকের কূটকৌশলে শিক্ষা পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক পণ্যে, ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ঘনিয়ে আসছে সংকট। স্বৈরশাসনের আমলে শিক্ষা শুধু বিপর্যস্তই হয়নি, প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে। সংস্কৃতির দারোগা সেজে বাংগালীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খবরদারী করার জন্যে রচিত হয়েছে সাংস্কৃতিক কমিশনের রিপোর্ট! এসব হয়েছে স্বৈরশাসনের কালে। কিন্তু বর্তমান সরকারতো জনগণের সরকার। জনতার সাথে তার সংযোগ রয়েছে। কাজেই নির্বাচনী বৈতরণী অতিক্রম করে পুনর্গঠনের কাজ শুরুর প্রাকালে হঠাৎ করে বাংলাদেশী ভাষার অবতারণার ব্যাপারটা সরষের ভেতরে ভূত দেখার সামিল। পাকিস্তান আমলে যে অশুভ শক্তি আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে পর্যুদস্ত করার জন্যে কামান দাগিয়েও সফল হতে পারেনি এবং বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের অনেক আগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিও দিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই অশুভ শক্তির পদধ্বনি আমাদের শংকিত করে। পাক আমলেও বাংলা ভাষার গায়ে লেবেল এঁটে পূর্ব পাকিস্তানী বানানো যেখানে সম্ভব হয়নি সেক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের ভাষা হবে বাংলাদেশী তা একেবারেই অসুস্থ চিন্তার সামিল।

মনে রাখতে হবে, বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণেই আমরা বাঙালী। বাংলাদেশে বসবাস করার কারণে প্রথমে আমরা ছিলাম বাঙালী, পরে হলাম বাংলাদেশী। বাংলাদেশী ভাষার ব্যাখ্যাটা কি রকম হবে কে জানে? তাছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে সব সময়ই আমরা গর্বিত। আমরা মনেকরি আমাদের আশা–আকাংখার অমৃত লোকের নির্ঝরিণী প্রবাহও হচ্ছে আমাদের ওই এক ভাষা ও সংস্কৃতি। এ ব্যাপারে এদেশের মানুষ অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তার প্রমাণ ইতহাস। সে ইতিহাস ভুলে গেলে মারাত্মক ভুল করা হবে। রক্ত দিয়ে আমরা ভাষাকে রক্ষা করেছি, রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি, রক্ত দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পথ উন্মুক্ত করেছি। আমাদের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে খেলা করতে গেলে প্রতিবাদের ঝড় উঠতে বাধ্য। ১৯৬৭ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। পরিণামে রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন আমাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি একদিন অসম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিল, সে সঙ্গীতই এক সময় জাগিয়েছিল প্রেরণা, আজ পেয়েছে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা। পাকিস্তান–আমলে প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্র সজাগ ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়াশীলরা বরাবরই একই কূটকৌশলে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে বারবার। কিন্তু জনগণ যে কি তার প্রমাণ নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থান। কাজেই জনগণের সেন্টিমেন্ট নিয়ে কাজ করার আগে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করা উচিত। শিক্ষা ব্যবস্থাকে যত সহজে ধ্বংস করা যায়, ভাষা ও সংস্কৃতির বেলায় তা সহজতর নয়। এদেশের মানুষের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ কম বলে শিক্ষাকে নিয়ে রাজনীতির খেলা জমে। কিন্তু শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ না থাকলেও এদেশের মানুষ ভাষা ও সংস্কৃতি বিমুখ নয়।

শিক্ষার ব্যাপারে সব সময় সংকোচননীতি গভীরভাবে কাজ করেছে। জীবনের সাথে সংযোগ না থাকার ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরস পলি মাটির আস্তরণ ক্রমান্বয়ে খসে পড়েছে। ব্রিটিশেরা যে বিষ শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢুকিয়েছিল পাকিস্তান আমলেও তা বহাল ছিল। ফলে পাক আমলেও শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা কখনো স্থির ও নিশ্চিত হতে পারেনি। জীবনমুখী না হওয়ার ফলে তার প্রয়োগগত গুরুত্ব তেমন একটা চোখে পড়েনি। সাধারণ মানুষও আকৃষ্ট হবার তাগিদ অনুভব করেনি। তবে হ্যাঁ, স্বাধীনতার পরপরই সবার জন্যে শিক্ষার একটি সুযোগ সৃষ্টি করার আলামত পাওয়া গিয়েছিল। খানিকটা আশার সঞ্চার হয়েছিল খুদা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪) দেখে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সে কমিশনের সুপারিশগুলো নিয়ে কোন প্রকার পরীক্ষা–নিরীক্ষা হয়নি। কেন হয়নি এর জবাব আজো ধোঁয়াটে।

দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো, নৈরাজ্য আর বৈষম্যের ঘূর্ণিবর্তে পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার দফা রফা হয়ে গেছে একেবারে। ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, বিভাগীয় বিধিবিধান লংঘন, সন্ত্রাস, অর্থ আত্মসাৎ, সেসনজট, নিরাপত্তাহীনতা সব মিলিয়ে শিক্ষা এক নাজুক পরিস্থিতির শিকার। শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ সব সময়ই কম এবং দেশের মোট জনসংখ্যা ১১ কোটি ৬৫ লাখের মধ্যে ৪ কোটি ৫০ লাখ বেকার এবং ৮ কোটি লোক নিরক্ষর। শিক্ষিতের হার ২৬ (মতান্তরে ৩১ শতাংশ)। প্রতিছর ২০ লাখ লোক নতুন করে নিরক্ষরের খাতায় নাম লেখাচ্ছে। অথচ শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা যা গোড়া থেকেই রয়েছে অবহেলিত ও সমস্যা জর্জরিত। সমস্যা সংকুল প্রাথমিক শিক্ষাকে সমস্যামুক্ত করার কোনরূপ বিধিবিধানের নিখুঁত বাস্তবায়ন কখনোও চোখে পড়েনি। পরপর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এদেশে প্রণীত হয়েছে সত্য, কিন্তু যথার্থ অর্থে বাস্তবায়ন হয়নি কোনটারই। প্রকল্পের পর প্রকল্প শুরু হয়েছে, অর্থ ব্যয় হয়েছে কিন্তু চাকা থেমে গেছে মাঝপথে। ফলে অর্থ, শ্রম ও সময়ের অপব্যয়ই সার হয়েছে। শৃংখলাহীনভাবে কাজ শুরু করলে ফলাফল হয় শূন্য। সমস্যা হয় দুরূহ।

একদিকে নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধতা, অপ্রতুল এবং ব্যয়বহুল শিক্ষা উপকরণ, বিষয়বস্তুতে অপ্রাসঙ্গিকতা, অসাধুতা, দুর্নীতি, ইতিহাস বিকৃতকরণ, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ উচ্ছেদ, শিক্ষাক্ষেত্রে অসুস্থ রাজনীতি, নীতিভ্রষ্টতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় শিক্ষার মানকে শুধু যে সন্দেহযুক্ত করেছে তা নয়, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার মূলেও হেনেছে কুঠারাঘাত। ক্ষমতায় যখনই যারা এসেছেন সকলেই একই বাক্যে উচ্চারণ করেছেন তারা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চান। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা যে একটি সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার সে বিষয়ে সুন্দর সুন্দর কথারও শেষ নেই। অথচ যত দোষ এদেশের মানুষগুলোর। জীবন ও জীবিকার জন্যে শ্রমজীবী মানুষগুলোর যখন নাভিশ্বাস উঠে তখন তাদের কাছে শিক্ষার চেয়ে কিশোর বা বালক সন্তানটিকে চায়ের দোকানে বা গার্মেন্টস্ দোকানে শ্রম বিকানোটাই বাস্তব এবং প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃতি পায়। এসব মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্যে সত্যিকার অর্থে কে ভাবে?

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ও সংস্কৃতিমন্ত্রীর মতে, গত একশ' বছরের প্রচেষ্টায় আমাদের দেশে মাত্র ৩০ শতাংশ লোক স্বাক্ষরতা অর্জন করেছে। দেশের সব লোককে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে উপার্জন, উৎপাদন ও জীবনমুখী করে তুলতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি, সামাজিক সমস্যা ও অধিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হবে যাতে মানুষের সুপ্তবাসনা সফল করে তোলা যায় এবং এ ব্যাপারে তিনি ছাত্র–শিক্ষকদের সহায়তা করার আহবান জানিয়েছেন।

কিন্তু কথা হচ্ছে বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, উৎপাদন ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব, বেকার সমস্যা, চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ, অপরিচ্ছন্ন শহর–নগর–বন্দরে পানীয় জলের অভাব, সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সব ঘটনা ঘটছে তা সকলেরই জানা। ছাত্র– শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্ক কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তাও আঁচ করা সম্ভব। কেন গেছে তাও অজানা নয়। নিরাপত্তাহীনতা কখনো কোন শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, সততা, আন্তরিকতা, নির্লোভতা, সহিষ্ণুতা,দক্ষতা, সাধুতা এবং নিরপেক্ষতার গ্যারান্টি না থাকলে শিক্ষাকে কোনদিনই জনগণের কাছে পৌঁছানো যাবে না। কমল হীরের পাথর শিক্ষাটাকে স্বগৃহে আনার ব্যবস্থা না করে যদি তার আলো খোঁজা হয় তাহলে অন্ধকার আরো ঘনীভূত হবে। আর বাংগালী সংস্কৃতি আর বাংলা ভাষার গায়ে কোন প্রকার লেবেল আঁটার আগে তার পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা–ভাবনা করা উচিত। বাংলাদেশের পাবলিককে যত বোকা ঠাওরানো হোক না কেন আসলে তারা অতো বোকা নন। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানকে কি এত সহজে ভোলা চলে?